daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 20-12-19 (P-12)

BRRI-87 becoming paddy of choice for Benapole farmers

BENAPOLE: The newly-invented BRRI-87 variety's shorter lifespan, high yield and greater resistance to pests are encouraging farmers in the area to cultivate the slender variety of rice.

Farmers have found BRRI-87 to be a better option compared to the golden variety they used to cultivate earlier. The new variety takes 127 days to mature, nearly three weeks less than the Swarna variety. The yield is 27-30 maunds (37.42 kgs) per bigha, reports UNB.

Before the new variety was invented by the Rice Research Institute, farmers had hard time selling Swarna and Guti-Swarna rice. But the slender variety of BRRI-87 has turned the table.

Farmers get the expected yield even if they plant this rice on high land. As the lifespan of BRRI-87 is short, the land can be used for producing multiple crops.

Soutom Kumar, the agriculture officer of Sharsha upazila, the new variety of rice was sown on 30 bighas in 11 unions.

BRRI-87 has been gaining popularity among farmers after Bangladesh Rice Research Institute examined its yield from various regions in the country and determined its lifespan in 2016.

A fully mature rice plant grows up to 122 centimetres and does not bend over as the stem is quite strong. The leaf is light green in colour while the flag leaf is longer, wider and more erect than the BRRI-49 variety. The stem and leaves remain green when the rice ripens and the size of the rice grain is long and slender. The 'Amylose' in BRRI-87 is 27 percent.

The lifespan of BRRI-87 is seven days less than BRRI-49 while its yield is higher, too.

BRRI-87 has to be cultivated between the first and 21st day of Bangla month of Ashar. The seedling must be 25-30 days old. Two to three seedlings must be sown in every cluster and the plants should be 25-15 centimetres apart.

For every bigha, 24kg of Urea, 11kg of TSP, 13kg of MOP, 9kg of Gypsum and 1.6kg of Zinc Sulfate fertiliser are needed.

Farmers can increase the amount of fertiliser depending on the region they are cultivating. If water is required, it must be provided through irrigation until the rice grain becomes firm and matured.

In case of disease or pest infestation, the agricultural office suggests using its combined pest extermination system.

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ২০-১২-১৯ (পৃঃ ১৪)

উফশী জাতের আবাদে ঝুঁকছেন কৃষক

কলাপাড়ায় ১৫ হাজার একর কৃষি জমি কমলেও ফলন বেড়েছে ৩২ হাজার মেট্রিক টন

মেজবাহউদ্দিন মাননু, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী ॥ সাগরপারের উপকূলীয় কলাপাড়ায় গত দশ বছরে কৃষি জমি কমেছে প্রায় ১৫ হাজার একর। কিন্তু ফলন কমেনি, উল্টো বেড়েছে ৩২ হাজার মেট্রিক টন ধানের উৎপাদন। যেখানে ২০০৮ সালে আমন ধানের উৎপাদন ছিল এক লাখ চার হাজার ৭২০ মেট্রিক টন। সেখানে ২০১৮ সালে ধানের ফলন হয়েছে এক লাখ ৩৫ হাজার ৪৯০ মেট্রিক টন। উফশী জাতের ধানের আবাদ ২০০৮ সালে হয়েছে ২০ হাজার ৩০৩ একর জমিতে। সেখানে ২০১৮ সালে উফশী জাতের ধানের আবাদ হয়েছে ৫৯ হাজার ৫২৭ একর জমিতে। উফশীর আবাদ বেড়েছে ৩৯ হাজার একর জমিতে। জমি কমলেও কৃষকরা উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের আবাদ বাড়িয়ে কৃষক ধানের ফলন বৃদ্ধি করেছে। জমি কমলেও এর প্রভাব পড়েনি উৎপাদনে। কৃষকরা উদ্যমী হয়ে প্রশিক্ষিতভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে এ জনপদে খাদ্য উৎপাদনের অগ্রগতি ধরে রেখেছেন। তারপরও পরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, উন্নয়ন কর্মের জন্য দুই এবং তিন ফসলি কৃষি জমি ব্যবহারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার দাবি করেছেন কৃষকরা। খাদ্যে উদ্বৃত্ত এ জনপদে এখনও ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন সাগরপারের চাষীরা। সরেজমিন অনুসন্ধান করে কৃষিতে বিপ্লবের এ দৃশ্য উঠে এসেছে।

বিস্ময়কর উন্নয়নের জনপদ সাগরপারের কলাপাড়া। যেখানে এখন কর্মমুখর পায়রা সমুদ্র বন্দর। পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র চালুর অপেক্ষায়। আরও একাধিক বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। চলমান রয়েছে শের-ই-বাংলা নৌঘাঁটি। এসব উন্নয়ন কর্মে প্রায় সাত হাজার একর কৃষি জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এসব জমির প্রায় পাঁচ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। করা হচ্ছে সাতটি পুনর্বাসন পল্লী। এসব কারণে ফসলি জমি কমেছে। এছাড়া পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার উন্নয়নে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন কর্ম চলছে এগিয়ে। আবাসন আগ্রাসনসহ অপরিকল্পিতভাবে দেদার বাড়িঘর নির্মাণের কারণে কৃষিজমি কমছে দ্রুত। লালুয়ার চারিপাড়া, পশুরবুনিয়া, নয়াকাটা, নাওয়াপাড়া, চৌধুরীপাড়া, ধঞ্জুপাড়া, ১১ নং হাওলা, বানাতিপাড়া, ছোট পাঁচ নং, বড় পাঁচ নং, মুন্সীপাড়া, মঞ্জুপাড়া (আংশিক) ও চরচান্দুপাড়া গ্রামের আমন ক্ষেত অনাবাদি পড়ে আছে। কমপক্ষে চার হাজার একর জমি এবছর কৃষকরা চাষাবাদ করেনি। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এসব জমি বাড়িঘর অধিগ্রহণ করেছে। এ কারণে চাষাবাদ করতে কৃষকদের নিষেধ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা কৃষক দেলোয়ার মাস্টার জানালেন, এসব জমিতে কৃষক আমনের বাম্পার ফল পেত। ফলাতো রবিশস্যসহ সবজি। এভাবে গত দশ বছরে অন্তত ১৫ হাজার একর কৃষি জমি কমেছে এই জনপদের।

এসব সমস্যার পাশাপাশি কৃষিকাজে ব্যবহারের খাল-বিল, জলাশয় দখল ভরাট হয়েছে বিপুল সংখ্যক। তারপরও এ জনপদে কৃষি উৎপাদন কমেনি। লবণসহিষ্ণু জাতের ধানসহ সবজির আবাদ বেড়েছে। বেড়েছে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের আবাদ। কৃষকরা আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদে ঝুঁকেছেন। এক ফসলি কৃষি জমি পরিণত হচ্ছে দুই-তিন ফসলি জমিতে। যেন কৃষিতেও বিপ্লব হয়েছে গেল ১০ বছরে। কৃষকরা হয়েছে আরও উদ্যমী এবং কৌশলী। খাদ্যে উদ্বৃত্ত এই জনপদের ঐতিহ্য কৃষকরা ধরে রেখেছেন। কৃষিবিভাগও নতুন নতুন ধান, রবিশস্যসহ সবজির আবাদের কৌশল শেখাচ্ছেন। কৃষকরাও লাভের মুখ দেখতে পারছে। তাই তারা এ পেশায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। ধানের পাশাপাশি সবজি এবং ফলদ জাতের গাছের বাগান করছেন। ১২ মাস কোন না কোন ফসল উৎপাদন করছেন কৃষকরা।

সরেজমিনে অনুসন্ধান জানা যায় এ জনপদে কৃষি বিপ্লবের গল্প। কুয়াকাটাগামী মহাসড়ক লাগোয়া বাড়ি ইসলামপুর গ্রামের কৃষক আব্দুল গণি মোল্লা। বয়স ৭৪ বছর। শরীরের কাঠামো এখনও ধরে রেখেছেন। জানালেন তিনি, ২০০৮ সালের আগে এক কানি (৮ বিঘা) জমিতে সর্বোচ্চ ধানের ফলন পেতেন ৭০-৭৫ মণ। আর এখন কমপক্ষে ১২০ মণ। প্রথমে উফশী জাতের ধান বাড়িতে নিয়ে আসেন কৃষি কর্মকর্তা। সঙ্গে প্রয়াত চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ মুন্সী ছিলেন। বলে-কয়ে আবাদ করাতে রাজি করছিলেন তাকে। উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের ধানের আবাদ শুরু করেন। একটি মাত্র ফসল ছিল, আমন। আর এখন

অন্তত পক্ষে দুইটি ফলন ফলাচ্ছেন। আগে এলোপাতাড়ি ধানের চারা রোপণ করতেন। আর এখন সারিবদ্ধভাবে রোপণ করেন। জানালেন এ বয়োবৃদ্ধ মানুষটি, পুকুরের পানি সেচ দিয়ে বোরোর আবাদ শুরু করেছিলেন। এখন, এ বছর তিনি উফশী বি-৭৬,৭৭ জাতের আবাদ করেছেন। কলাপাড়া, বরগুনা, মানিকগঞ্জের শিবালয় গিয়ে অসংখ্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। গল গল করে অন্তত সাতজন কৃষি কর্মকর্তার নাম বললেন মানুষটি। আর উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা তো এ মানুষটির ছেলেদের মতো বাড়িঘরে যায়। গোটা বাড়িতে আম, তেঁতুল, তাল, কুল, আপেল, মালটাসহ অসংখ্য ফলদ গাছে পরিপূর্ণ। গণি মোল্লা এখনও শক্ত সুঠাম দেহের অধিকারী। মেজ ভাই শামসুল হক মোল্লা, ছোট ছিদ্দিক মোল্লা সবাই পরিপূর্ণ কৃষক পরিবার।

অভিজ্ঞতার ঝুলি খুবই সমৃদ্ধ গণি মোল্লার। জানালেন এখন কৃষকরা মিঠা পানি পেলে বছরে আমন, বোরো ও আউশ তিনটি ফসল ফলাতে পারতেন। তার পরামর্শ খাল ও স্লুইস গেটের নিয়ন্ত্রণ প্রকৃত কৃষকের হাতে থাকতে হবেই। পাশাপাশি ধানের ন্যায্যমূল্য থাকা খুবই জরুরী বলে মনে করেন এ কৃষক। তার দাবি এখন এক কানি ৮ বিঘা জমি চাষাবাদে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়। সেখানে ১২০ মণ ধান বিক্রি করতে হয় ৬০০ টাকা দরে মাত্র ৭২ হাজার টাকা। প্রান্তিক কিংবা বর্গা চাষীরা ধান চাষাবাদে আগ্রহ হারিয়ে ফলদ জাতের বাগান কিংবা সবজির আবাদে ঝুঁকছে। এতে ধানের চেয়ে দ্বিগুণ লাভ হয়। গণি মোল্লার মন্তব্য, দিনের পর দিন বাড়িঘর বাড়ছে। রাস্তাঘাট বানানো হচ্ছে। চাষের জমি কমছে। কিন্তু কৃষকরা উফশী জাতের ধান আবাদ করায় ফলন কমেনি।

নীলগঞ্জের কুমিরমারা গ্রামের সফল চাষী সুলতান গাজী (৬২)। দুপুরে সবজি ক্ষেতে কাজ করছিলেন। জানালেন তিনি, এ বছর আট বিঘা জমির সবটায় উফশী জাতের (বিআর-১১) ধানের আবাদ করেছেন। কমপক্ষে এক শ' মণ ফলন পাওয়ার আশাব্যক্ত করলেন এ চাষী। সুলতান গাজী আরও বললেন, গেল বছর আমন ছাড়াও ছয় বিঘা জমিতে হাইব্রিডের আবাদ করে এক শ' মণ ধান পেয়েছেন। দেড় একর জমিতে সবজির আবাদ করেছেন। ক্ষেতেই ১২ মাস। জীবন-জীবিকায় যেন স্বস্তির ছাপ ফুটে আছে মানুষটির চোখে-মুখে। মানুষটির ভাষ্য, 'মুই ২০০৮ সালে উফশী ধানের আবাদ শুরু করি। আর থামি নাই। এর আগে কানি (৮বিঘা) জমিতে সর্বোচ্চ ৪০/৪৫ মণ ধান পাইতাম।' সাফ কথা সুলতান গাজীর, কৃষি জমি কমছে কিন্তু উফশী জাতের আবাদের কারণে ফলন বাড়ছে। মিঠা পানির সমস্যা সমাধান করতে স্লুইস সংযুক্ত খালের নিয়ন্ত্রণ কৃষকের কাছে দেয়ার দাবি এ কৃষকের। ৩৫ হাজার কৃষক পরিবারের এখন প্রধান দাবি এমনটি।

কৃষি অফিস কলাপাড়ার দেয়া তথ্যমতে, ২০০৮ সালে কলাপাড়ায় উফশী জাতের ধানের আবাদ হয় মাত্র ২০ হাজার ৩০৩ একর জমিতে। ফলন হয় ২৮ হাজার ৭৭০ মেট্রিক টন। আর ২০১৩-২০১৪ সালে উফশী ধানের আবাদ হয় ৪৬ হাজার ৫৫৯ একর জমিতে। ফলন হয় ৭৫ হাজার চার শ' মেট্রিক টন। এখন ২০১৮-২০১৯ সালে আবাদ হয়েছে উফশী জাতের ৫৯ হাজার ৫২৭ একর জমিতে। আর ফলন হয়েছে এক লাখ আট হাজার ৪৫০ মেট্রিক টন। অথচ উল্টোচিত্র চাষাবাদের জমির হিসেবে। ২০০৮ সালে স্থানীয় জাতসহ মোট আবাদি কৃষি জমি ছিল ৯৫ হাজার ৩৪২ একর। আর এখন ২০১৮ সালে কমে চাষের জমির পরিমাণ হয়েছে ৮৫ হাজার ২১৫ একর। সরকারী হিসেবে কলাপাড়ায় চাষের জমি কমেছে ১০ হাজার ২১৭ একর। যেখানে ফলন কমার কথা ৪০ হাজার মেট্রিক টন। উল্টো ফলন বেড়েছে অন্তত ৩২ হাজার মেট্রিক টন।

সরকারী হিসেব এটি হলেও বেসরকারী হিসেবে কৃষি জমি কমেছে অন্তত ১৫ হাজার একর। কলাপাড়ায় বর্তমানে সরকারী হিসেবে দুই লাখ ৪৯ হাজার ৩৮৮ জন মানুষের জন্য খাদ্য চাহিদা ৪০ হাজার ২৩৪ মেট্রিক টন চাল। যেখানে উৎপাদন হচ্ছে ৭৯ হাজার ৩৫০ মেট্রিক টন চাল। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মান্নান জানান, এরপরও কৃষকের কৃষিকাজের সুবিধার্থে বেড়িবাঁধ মেরামত করা, স্লুইস ও কালভার্ট মেরামত, হাজামজা খাল খনন করা, লবণাক্ততা সহনশীল বোরো ধানের আবাদ আরও বৃদ্ধি করা, ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের আবাদ বাড়ানো, কৃষককে পাওয়া পাম্প ক্রয়ে উৎসাহিত করা, জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করা, আমন ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে জমি চাষ দিয়ে জো ধরে রাখা, উন্নতমানের বীজ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, সুষম হারে সার ব্যবহারে সচেতন করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।